আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী -৫

অভিজিৎ রায়
www.mukto-mona.com

পাঠকদের অনেকেই ব্যক্তিগত ভাবে ই-মেইল করে এই সিরিজটির প্রতি তাঁদের আগ্রহ আর ঔৎসুক্য প্রকাশ করেছেন; তাঁদের কথা মনে রেখেই এটিকে এগিয়ে নেওয়ার প্রচেষ্টা। সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

অভিজিৎ
২৭/৭/২০০৩

পূর্ববর্তী পর্বের পর হতে...

১

মোটামুটি সকল বিজ্ঞানীরাই এখন এ ব্যাপারটি মেনে নিয়েছেন যে, প্রচন্ড ঘন আর উত্তপ্ত অবস্থা থেকে ভয়ঙ্কর এক মহাবিস্ফোরনের মধ্য দিয়ে আমাদের এই মহাবিশ্বের সৃষ্টি। তবে সেই ঘন আর উত্তপ্ত অবস্থাটা কিরকম আমরা এখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। আর কেনই বা এই বিস্ফোরণ হয়েছিল তাও খুব পরিস্কার নয়। আসলে মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণটা কি আর কেনই বা এই মহাবিশ্বের অস্তিত্ব তা এখনও বিজ্ঞানের আওতার বাইরে। বড় বড় বিজ্ঞানীরা তাদের পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা আর জ্ঞান থেকে বিভিন্ন ধরনের অনুকল্প হাজির করেছেন - তবে তাদের ধারণা সঠিক কিনা এটা জানবার মত পর্যাপ্ত তথ্য এখনও আমাদের হাতে নেই। কেন বিজ্ঞান বিগ-ব্যাং বা তার পূর্ববর্তী অবস্থাকে এ মুহূর্তে ব্যাখ্যা করতে পারছে না? সহজ কথায়, সৃষ্টির আদিমতম অবস্থাকে ব্যাখ্যা করা মত উপযুক্ত তত্ত্ব এখনও আমাদের হাতে নেই। বিজ্ঞানীরা 'ধারণা' করেন যে, মহাকর্ষ সহ অন্যান্য মৌলক বলগুলো (তড়িচ্চুম্বক বল, সবল নিউক্লিয় বল আর দুর্বল নিউক্লিয় বল) একীভুত অবস্থায় বিরাজ করত বিগ-ব্যাং ঘটে যাবার $১০^{-৪৩}$ সেকেন্ড পর্যন্ত। প্রকৃতি জগতের এই চারটি মৌলিক বল সম্পর্কে এই

ফাঁকে কিছু বলে নেওয়া যাক। বর্তমান প্রেক্ষাপটে এই চারটি বল একটি অপরটি থেকে সবসময়ই ভিন্ন আচরণ প্রকাশ করে। মহাকর্ষ এবং তড়িচ্চুম্বক বলের সীমা অনেক বেশী, এদেরকে বলে ব্যস্ত-বর্গ বল (inverse square forces), কিন্তু সবল আর দুর্বল নিউক্লিয় বলগুলোর সীমা অনেক অল্প - যথাক্রমে $১০^{-১৫}$ এবং $১০^{-১৭}$ মিটার মাত্র। আর তা ছাড়া এই বলগুলো সব পদার্থের উপরই একই রকমভাবে ক্রিয়া করে তাও নয়। যেমন, মহাকর্ষের প্রভাব রয়েছে সকল পদার্থের উপরেই। কিন্তু তড়িচ্চুম্বক বল ক্রিয়া করে শুধু আধানযুক্ত কণার (Charged particle) উপরে। সবল নিউক্লিয় বল প্রোটন বা নিউ ট্রনের মত নিউক্লিয় কণার উপরে শুধু কার্যকরী, ইলেকট্রন এবং নিউট্রিনোর উপর এর কোন প্রভাব নেই। আর দুর্বল বল নিউক্লিয় বিক্রিয়া আর তেজস্ক্রিয় ক্ষয়িষ্ণুতার উপরেই কেবল কার্যকরী। সবল নিউক্লিয় বল তড়িচ্চুম্বকীয় বলের চেয়ে ১৩৭ গুন শক্তিশালী, দুর্বল নিউক্লিয় বলের চেয়ে ১ লক্ষ গুন আর মহাকর্ষের চেয়ে প্রায় $১০^{৩৯}$ গুন শক্তিশালী।

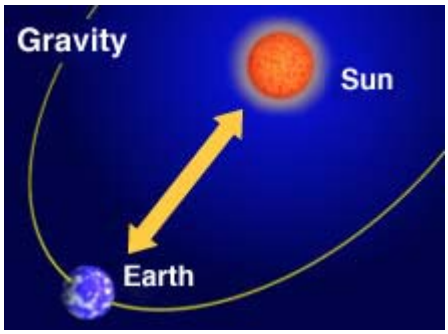

Known as gravity, the distance over which this force acts is infinite.

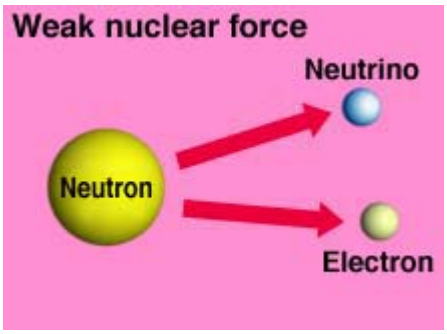

This force causes natural neutron decay (beta decay). As a result, the neutron for a short time becomes a proton. Distance over which this force acts is 1/100,000,000 □ ~ 1/100,000,000 □ ~ 10 cm.

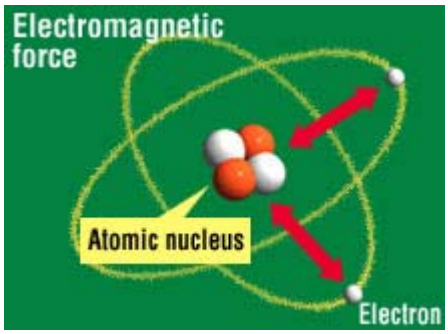

This force acts on electrically charged particles. It is the force that binds electrons to atomic nuclei. The distance over which this force acts is infinite.

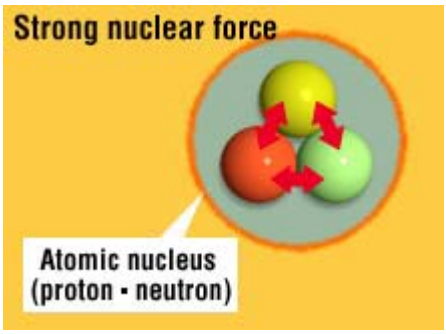

This force bonds quarks together. It works to stabilize neutrons, protons and atomic nuclei. Distance over which this force acts is 1/100,000,000 □ ~ 1/10,000 □ ~ 10 cm.

১৯২০ সালের পর হতেই আইনস্টাইন প্রকৃতি জগতের এই মৌলক বল চারটিকে একীভুত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। খুবই উচ্চাভিলাসী ছিল তার সেই স্বপ্ন। বহুবার আইনস্টাইন ভেবেছিলেন যে তার স্বপ্নের জাদুর কাঠি বুঝি হাতে পেয়ে গেছেন - কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার সেই স্বপ্ন অপূর্ণই থেকে যায়। আইনস্টাইনের মৃত্যুর দুই দশকের মধ্যে পদার্থবিদরা এই একীভুত ত্তত্বের ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেন।

আবদুস সালাম (১৯২৬-১৯৯৬)

ষাটের দশকে এই ত্তত্বীয় পদার্থবিদরা সফল ভাবে তড়িচ্চুম্বকীয় বল আর দুর্বল নিউক্লিয় বলকে 'এক করতে' সমর্থ হন যাকে এখন অভিহিত করা হয় 'দুর্বল তড়িৎ' বল (electro-weak force) হিসেবে। ১৯৭০ সালে দুর্বল তড়িৎ তত্ত্বের পরীক্ষালব্ধ সত্যতা নির্নীত হয়। এই সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ আবদুস সালাম, স্টিফেন ওয়েইনবার্গ আর শেলডন গ্লাসো ১৯৭৯ সালে নোবেল পুরস্কারে ভুষিত হন। এর পর থেকেই বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টা শুরু হয় দুর্বল তড়িৎ আর সবল নিউক্লিয় বলকে একীভুত করার ব্যাপারে।

যে থিওরীগুলো এই দুর্বল তড়িৎ আর সবল নিউক্লিয় বলকে একীভূত করে তাদের বলা হয় Grand Unified Theories বা সংক্ষেপে GUTs. এই থিওরী হতে এটা সাধারণভাবে অনুমান করা হয় যে, এই তিনটি (সবল, দুর্বল আর তড়িচ্চুম্বক) নন-গ্র্যাভিটেশনাল বল সৃষ্টির প্রথম দিকে একীভূত অবস্থায় ছিল - যখন তাপমাত্রা ছিল প্রায় $১০^{২৮}$ ডিগ্রীর মতন। এটি উল্লেখ্য যে, এরকম অতি উচ্চ তাপমাত্রা তৈরী করা সহজ নয় বলে GUTs এর পরীক্ষালব্ধ প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নি।

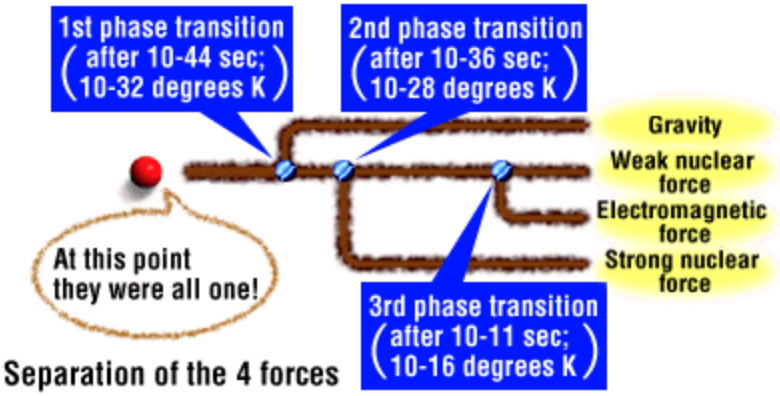

মহাকর্ষকে কোয়ান্টাম বল গুলোর সাথে সংযুক্তির চেষ্টায় এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা সাফল্যের মুখ দেখেননি। কিছু বিজ্ঞানীরা ব্যাপারটার সমাধান করতে চাইছেন গ্রাভিটন নামে একটা নতুন কণা কল্পণা করে - যা মহাকর্ষ বলের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। আলোর ক্ষেত্রে যেমন ফোটন কণা, তেমনি গ্রাভিটির ক্ষেত্রে কল্পণা করা হয়েছে গ্র্যাভিটন। তবে সমস্যা হচ্ছে যে, এভাবে মহাকর্ষের যে ছবিটা উঠে আসে তা কিন্তু আইনস্টাইন প্রদত্ত জ্যামিতিক ছবি (রিলেটিভিটি থেকে প্রাপ্ত) থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এভাবে প্রাপ্ত সমাধান শুধু জটিলই নয়, অনেক বিজ্ঞানীর কাছেই অগ্রহনীয়। বিকল্প সমাধানটি হচ্ছে আইনস্টাইনের দেওয়া জ্যামিতি থেকেই যাত্রা শুরু করা। এটি আসলে কিছুই নয়- মৌলিক বলগুলোকে দেশ-কালের (space-time) একটি অতিরিক্ত বক্রমাত্রার সাহায্যে ব্যাখ্যার প্রয়াস।

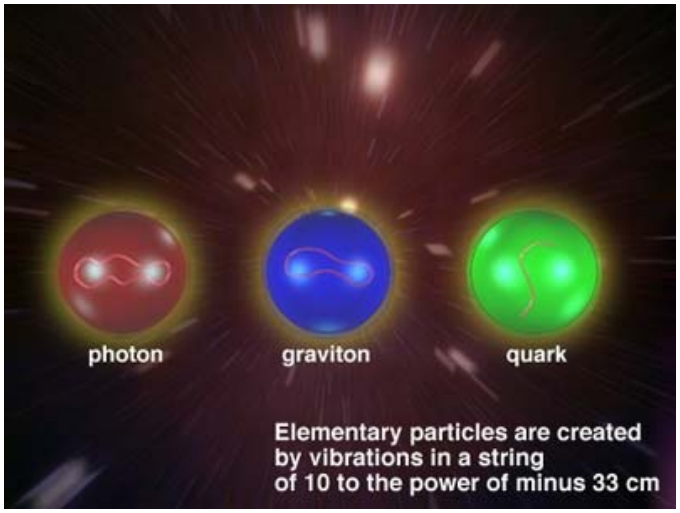

সুপারস্ট্রিং তত্ত্বের ভিত্তি গড়ে উঠেছে আসলে এই ধারণা থেকেই। ক্যালিফর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের হাঙ্গেরিয়ান তত্ত্বীয় পদার্থবিদ John Schwarz এই তত্ত্বের মূল প্রবক্তা। এই তত্ত্ব অনুযায়ী পদার্থের ক্ষুদ্রত্তম অংশগুলো কোন মৌলিক কণা নয়, বরং খুবই ছোট কম্পণশীল তন্তু (vibrating string)। তন্তুগুলোর দৈর্ঘ্য $১০^{-৩৩}$ সেন্টিমিটার। স্ট্রিং তত্ত্বের ধারণা অনুযায়ী, এই মহাবিশের বিস্তার দেশ কালের ১০ টি মাত্রায়। এর মধ্যে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ উচ্চতা আর সময় -এই চারটি সম্পর্কে আমরা ওয়াকিবহাল, কিন্তু বাকী ছয়টি মাত্রা আমাদের অগোচরেই স্ট্রিং এর মধ্যে কোকড়ানো অবস্থায় রয়ে গিয়েছে। গানিতিক জটিলতা আর বিমূর্ত ধারণা থাকা সত্ত্বেও অনেক পদার্থবিদরাই মনে করেন সুপার স্ট্রিং তত্ত্ব প্রকৃতিজগতের মৌলিক বলগুলিকে একীভূত করার প্রচেষ্টায় আশার আলো দেখাচ্ছে। তবে এখনি এ বিষয়ে শেষ কথা বলবার সময় আসেনি। ভবিষ্যতের গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ফলাফলই আমাদের সঠিক পথটি একসময় দেখিয়ে দিবে।

২

আগের পর্বে আমরা প্রসারণশীল মহাবিশ্ব সম্বন্ধে কিছুটা হলেও ধারণা পেয়েছি; বুঝেছি যে, এই মহাবিশ্ব আসলে প্রতি মুহূর্তেই প্রসারিত হচ্ছে। কিন্ত প্রশ্ন হচ্ছে, আমাদের এই মহাবিশ্ব কি সবসময়ই এমনিভাবে প্রসারিত হতে থাকবে? নাকি মহাকর্ষের টান একসময় গ্যালাক্সিগুলোর মধ্যকার প্রসারণের গতিকে মন্থর করে দিবে - যার ফলে এই প্রসারণ থেমে গিয়ে একদিন শুরু হবে সংকোচন? এই প্রশ্নটার উপরই কিন্তু আমাদের এই মহাবিশ্বের অন্তিম পরিনতি নির্ভর করছে। প্রসারণ চলতেই থাকবে নাকি এক সময় তা থেমে যাবে - এই ব্যাপারটা যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর নির্ভর করছে তা হল মহাবিশ্বের Critical Density ; বাংলা করলে আমরা বলতে পারি -'সন্ধি-ঘনত্ব'। এই সন্ধি ঘনত্বের বিষয়টা একটু পরিস্কার করা যাক। ধরা যাক, ভূ-পৃষ্ঠ থেকে একটা রকেট মহাশূন্যে উৎক্ষিপ্ত হল। এর পরিণতি কি হতে পারে? এক্ষেত্রে সম্ভাবনা দুটি।

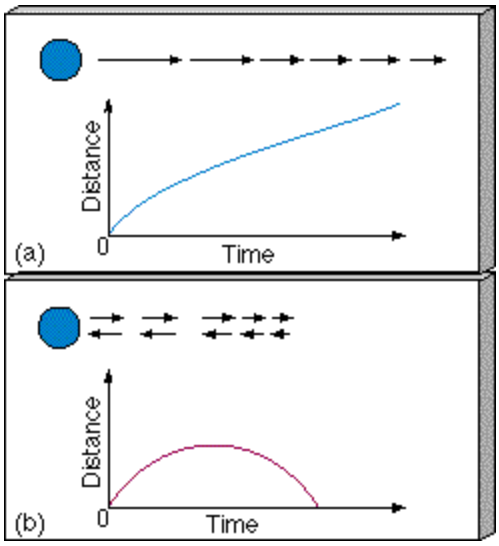

রকেটের বেগ যদি পৃথিবীর মুক্তিবেগের (escape velocity) চেয়ে বেশী হয় - মানে, এর বেগ যদি মাধ্যাকর্ষণকে অতিক্রম করার মত যথেষ্ট শক্তিশালী হয় - তবে তা আর পৃথিবীতে ফিরে আসবে না। তার প্রক্ষেপণের গতিপথ হবে পাশের প্রথম ছবির (a) মত অসীম বা অনন্ত (unbounded)। কিন্তু রকেটের বেগ যদি মুক্তিবেগের চেয়ে কম হয়, তবে তা চলতে চলতে একটা নির্দিষ্ট উচ্চতায় উঠবার পর মাধ্যাকর্ষনের টানে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসবে। এবারে কিন্তু প্রক্ষেপণের পথ আগের মত 'অনন্ত' হবে না; বরং হবে দ্বিতীয় ছবির(b) ছবির মত সীমাবদ্ধ (Bounded)।

মহাবিশ্বের অবস্থাও আমাদের উদাহরনের ওই রকেটের মতন। এর কাছেও এখন দুটি পথ খোলা। এক হচ্ছে সারা জীবন ধরে এমনিভাবে প্রসারিত হতে থাকা -এ ধরনের মহাবিশ্বের মডেলকে বলে অনন্ত মহাবিশ্ব (unbounded universe); আরেকটি সম্ভাবনা হল- মহাবিশ্বের প্রসারণ একসময় থেমে গিয়ে সংকোচনে রূপ নেওয়া - এ ধরনের মহাবিশ্বকে বলে বদ্ধ মহাবিশ্ব (bounded)।

বিজ্ঞানীরা অবশ্য এ দুই সম্ভাবনার মাঝামাঝি আরেকটি সম্ভাবনাকেও হাতে রেখেছেন। এর নাম দেওয়া যাক - 'বদ্ধ-প্রায় মহাবিশ্ব' (marginally bounded universe)। এধরনের মহাবিশ্ব সবসময়ই প্রসারিত হতে থাকবে ঠিকই কিন্তু এক্কেবারে দেওয়াল ঘেষে ঘেষে- অনেকটা পাশমার্ক পেয়ে কোন রকমে পাশ করে যেতে থাকা ছেলেপিলেদের মতন।

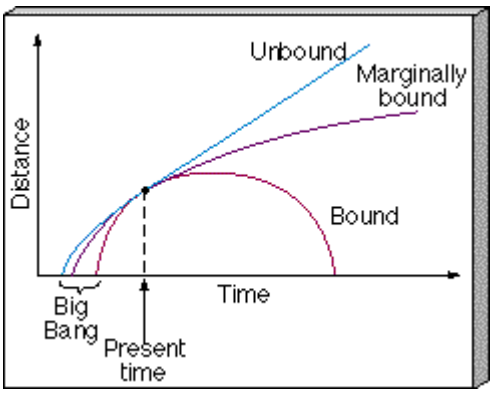

আমাদের রকেটের উদাহরণে ঠিক মুক্তিবেগের সমান (এর বেশীও নয়, কমও নয়) বেগ দিয়ে রকেটটাকে শুন্যে ছেড়ে দিলে যে রকম অবস্থা হত, অনেকটা সেরকম।

মহাবিশ্বের পরিনতির এই তিন ধরনের সম্ভাবনাকে উপরের ছবির সাহায্যে দেখানো হয়েছে।

এখন কথা হচ্ছে, আমাদের মহাবিশ্বের ক্ষেত্রে কোন্ ধরনের পরিনতি ঘটতে যাচ্ছে তা বোঝা যাবে কি ভাবে? আবার কিন্তু সামনে চলে আসছে সেই মহাবিশ্বের ঘনত্বের ব্যাপারটা। মহাবিশ্বের ঘনত্ব বলতে সমগ্র মহাবিশ্ব যে পদার্থসমূহ দিয়ে তৈরী তার ঘনত্বের কথাই বলছি। পদার্থ যত বেশী হবে - মহাবিশ্বও তত ঘন হবে -আর সেই সাথে বাড়বে প্রসারণকে থামিয়ে দেওয়ার মত মহাকর্ষের শক্তিশালী টান। জিনিসটা বুঝতে আবার আমাদের রকেটের উদাহরণে ফেরত যেতে হবে। রকেটের ওজন যত বেশী হবে মাধ্যাকর্ষন পেরিয়ে মুক্তি বেগ অর্জন করতে তাকে তত বেশী কষ্ট করেতে হবে। ঠিক তেমনি ভাবে, মহাবিশ্ব উচ্চ ঘনত্ব বিশিষ্ট হলে প্রসারণকে থামিয়ে দিয়ে সংকোচনের দিকে ঠেলে দেওয়ার মত যথেষ্ট পদার্থ এতে থাকবে -ফলে মহাবিশ্ব হবে বদ্ধ (bound)। আর কম ঘনত্ববিশিষ্ট মহাবিশ্ব সঙ্গত কারণেই হবে মুক্ত (unbounded)- যা প্রসারিত হতে থাকবে অনন্ত কাল ধরে। তাহলে এর মাঝামাঝি এমন একটা ঘনত্ব নিশ্চয়ই আছে যার উপরে গেলে মহাবিশ্ব এক সময় আর প্রসারিত হবে না। সন্ধি ঘনত্ব (Critical density) হচ্ছে সেই ঘনত্ব যা মহাবিশ্বের প্রসারণকে থামিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। বিজ্ঞানীদের ধারণা এর মান ১.১ x ১০$^{-২৬}$ কিলোগ্রাম পার কিউবিক মিটারের মতন। মহাবিশ্বের আসল ঘনত্ব (actual density)আর সন্ধি ঘনত্বের (critical density) অনুপাতকে পদার্থবিদরা খুব গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন; এর নাম তারা দিয়েছেন ওমেগা (Ω)। এই ওমেগার মান ১ এর কম হলে মহাবিশ্ব হবে মুক্ত বা অনন্ত (open / unbounded)। আর ওমেগার মান ১ এর বেশী হলে মহাবিশ্ব হবে বদ্ধ (closed / bounded)। আর ওমেগার মান পুরোপুরি ১ হলে প্রসারণের হার ধীরে ধীরে কমে যেতে যেতেও টায়ে টায়ে পাশ করা ছাত্রের মত প্রসারিত (flat / marginally bounded) হতে থাকবে শেষ পর্যন্ত।

সম্ভাবনাগুলোর কথা না হয় বোঝা গেল, কিন্তু মহাবিশ্বের আসল ঘনত্ব না জানলে তো হলফ করে বলা যাচ্ছে না রোজ হাসরের ময়দানে আমাদের মহাবিশ্বের ভাগ্যে আসলে ঠিক কি রয়েছে! তা হলে তো আসল ঘনত্ব জানতেই হচ্ছে। কিন্তু আসল ঘনত্ব বের করার উপায় কি? একটা উপায় হল মহাশূন্যের দৃশ্যমান গ্যালাক্সিগুলোর ভর একের পর এক যোগ করে তাকে পর্যবেক্ষনরত স্পেসের আয়তন দিয়ে ভাগ করা। মহাবিশ্বের পদার্থগুলোর একটা গড় ঘনত্ব পাওয়া যাবে এতে করে। কিন্তু মুশকিল হল এভাবে পদার্থের যে ঘনত্ব পাওয়া গিয়েছে তা হাস্যকর রকমের কম - সন্ধি ঘনত্বের শতকরা ১ - ২ ভাগ মাত্র। তার মানে ঠিক কি দাড়লো? দাড়ালো এই যে এই মান সঠিক হলে ওমেগার মান দাড়ায় ১ এর অনেক অনেক কম। তাহলে আমদের সামনে চলে আসলো

সেই মুক্ত বা অনন্ত মহাবিশ্বের মডেল। তার মানে কি এই যে, মহাশুন্য আজীবন প্রসারিত হতে থাকবে?

না, তাও নিশ্চিতভাবে এখনই বলা যাচ্ছে না। ব্যাপারটা এত সহজ নয়। বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যেই প্রমাণ পেয়েছেন যে, আমদের দৃশ্যমান পদার্থের বাইরেও মহাশুণ্যে একধরনের রহস্যময় পদার্থ রয়েছে যাকে বলা হয় গুপ্ত পদার্থ (Dark Matter)। এই অদৃশ্য পদার্থগুলোর অস্তিত্ব শুধুমাত্র গ্যালাক্সির মধ্যে মহাকর্ষের প্রভাব থেকেই জানা গিয়েছে, কোন প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ থেকে নয়। বিজ্ঞানের জগতে এমন অনেক কিছুই আছে যা প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে গৃহীত হয় নি, হয়েছে পরবর্তীতে পাওয়া পরোক্ষ প্রমাণ, অনুসিদ্ধান্ত বা ফলাফল থেকে। তবে তা বলে সেগুলো বিজ্ঞান-বিরোধীও নয়। যেমন, বিগ-ব্যাং এর ধারণা। কেউ চোখের সামনে বিগ-ব্যাং সংগঠিত হতে দেখেনি। কিন্তু কসমিক ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন সহ অন্যান্য পরোক্ষ প্রমাণগুলো কিন্তু ঠিকই বিগ-ব্যংকে বিজ্ঞানের জগতে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এমনি আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে বিবর্তনবাদ - যার চাক্ষুস প্রমাণ পাওয়া অসম্ভব হলেও অসংখ্য পরোক্ষ প্রমাণের ভিত্তিতেই 'আদম-হাওয়া' ধরনের বিশ্বাস-নির্ভর সৃষ্টিতত্ত্বকে হটিয়ে তা বিজ্ঞানের জগতে এখন স্থায়ীভাবে জায়গা করে নিয়েছে।

যা হোক, আবার আমরা গুপ্ত পদার্থের জগতে ফিরে যাই। কি ভাবে জানা গিয়েছিল এই অদৃশ্য পদার্থের অস্তিত্ব?

ভেরা রুবিন (১৯২৮ -)

এই ঘটনাটি বলতে গেলে ভেরা রুবিনের কথা বলতেই হয়। তিনিই সর্বপ্রথম আমাদের ছায়াপথ আর অন্যান্য সর্পিলাকার গ্যালাক্সিগুলোতে ডার্ক ম্যাটারের অস্তিত্বকে অত্যন্ত জোড়ালো ভাবে প্রতিষ্ঠা করেন। মূলতঃ রুবিনের কাজই পরবর্তীতে টনি টাইরণের মত জ্যোতির্বিদদের গুপ্ত পদার্থের বিষয়ে গবেষণায় আগ্রহী করে তুলে। ব্যাপারটি একটু ব্যাখ্যা করা যাক।

আমাদের গ্যালাক্সির কেন্দ্র থেকে অনেক দূরবর্তী নক্ষত্ররাজির গতিবেগ কেন্দ্রের কাছাকাছি অবস্থিত নক্ষত্ররাজির বেগের তুলনায় কম হওয়ার কথা; ঠিক যেমনটা ঘটে আমাদের সৌরজগতের ক্ষেত্রে। সূর্য থেকে যত দুরে যাওয়া যায়- গ্রহগুলোর গতিবেগও সেই হারে কমতে থাকে। কারণটা খুবই সোজা। নিউটনের সুত্র থেকে আমরা জেনেছি

যে, মাধ্যাকর্ষণ বলের মান দুরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক। মানে দুরত্ব বাড়লে আকর্ষণ বলের মান কমবে তার বর্গের অনুপাতে। টান কম হওয়ার জন্যই দূরবর্তী গ্রহগুলো আস্তে ঘোরে। আমাদের ছায়াপথের ক্ষেত্রেও ঠিক একই রকম ঘটনা ঘটবার কথা। কেন্দ্র থেকে দূরবর্তী নক্ষত্রগুলো তাদের কক্ষপথে কেন্দ্রের কাছাকাছি নক্ষত্রগুলোর চেয়ে আস্তে ঘুরবার কথা। কিন্তু রুবিন যে ফলাফল পেলেন তা এক কথায় অবিস্মরনীয়। দূরবর্তী নক্ষত্রগুলোর ক্ষেত্রে গতিবেগ কম পাওয়া গেলই না বরং একটা নির্দিষ্ট দূরত্বের পর সকল নক্ষত্রের গতিবেগই প্রায় একই সমান পাওয়া গেল। অন্যান্য সর্পিলাকার গ্যালাক্সি গুলো (যেমন অ্যান্ড্রোমিডা) পর্যবেক্ষণ করেও রুবিন সেই একই ধরনের ফলাফল পেলেন। তার এই পর্যবেক্ষণ জ্যোতির্বিদদের ভাবনায় ফেলল। হয় রুবিন কোথাও কোন ভুল করছেন, অথবা এই গ্যালাক্সির প্রায় পুরোটাই এক অজ্ঞাত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পদার্থে পূর্ণ। রুবিন যে ভুল করছেন না এই ব্যাপারটা আরো ভালোভাবে বোঝা গেল অ্যান্ড্রোমিন্ডা গ্যালাক্সি পর্যবেক্ষণ করে। দেখা গেল ২২ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরের এই গ্যালাক্সিটি ঘন্টায় প্রায় ২ লক্ষ মাইল বেগে আমাদের দিকে ছুটে আসছে। এই অস্বাভাবিক গতিবেগকে মহাকর্ষ জনিত আকর্ষণ দিয়েই কেবলমাত্র ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু দৃশ্যমান পদার্থ তো পরিমানে অনেক কম - ফলে মহাকর্ষের টান তো এত ব্যাপক হবার কথা নয়! তাহলে? তাহলে কোথাও নিশ্চয়ই বিশাল আকারের অদৃশ্য পদার্থ এই দুই গ্যালাক্সির মাঝে লুকিয়ে আছে। বিশাল আকার যে কতটা বিশাল তা বোধ হয় অনুমান করা যাচ্ছে না। এই অদৃশ্য পদার্থের আকার আমাদের যে ছায়াপথ সেই 'মিল্কিওয়ে' এর মোটামুটি দশ গুন!

গুপ্ত পদার্থ আছে - তা না হয় বোঝা গেল - কিন্ত কেমনতর এই পদার্থগুলো? এদের বৈশিষ্ট্যই বা কি রকম? সত্যি বলতে কি - আমরা এখনও তা বুঝে উঠতে পারিনি। গুপ্ত পদার্থগুলোয় নিশ্চিতভাবে কোন ঝলমলে নক্ষত্র নেই - থাকলে তো আর তারা গুপ্ত (Dark) থাকত না। এতে ধূলি কণাও (dust grain) থাকতে পারবে না - কেন না এই ধূলি কণা গুলো দূরবর্তী গ্যালাক্সি থেকে আগত আলোকে আটকে দেবার জন্য এবং সেই সাথে আমাদের চোখে ধরা পড়বার জন্য যথেষ্টই বড়। তা হলে কি আছে এতে? আসলে বিজ্ঞানীরা যে তত্ত্ব দিয়েছেন তা যদি সত্যি হয়ে থাকে, গুপ্ত পদার্থগুলো আমাদের চেনা জানা কোন পদার্থ দিয়েই তৈরী হওয়ার কথা নয়। সে জন্যই তারা রহস্যময় এবং গুপ্ত। কৃষ্ণ গহবর আর নিউট্রিনোগুলো এর একটা সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হতে পারে অবশ্য। বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করে যাচ্ছেন যতদূর সম্ভব এদের সম্বন্ধে জেনে সঠিক ধারণায় পৌঁছুতে কারণ মহাবিশ্বের প্রাথমিক অবস্থার সাথে তাদের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ট।

আরেকটি কারণেও ডার্ক ম্যাটার গুরুত্বপূর্ণ। সেই যে ওমেগার ব্যাপারটা। বিজ্ঞানীরা ভাবছেন যে, এই মহাবিশ্বের প্রায় ৯৯ ভাগ পদার্থই গুপ্ত পদার্থ হতে পারে। তাই যদি

হয়, তবে মহাশূণ্যের বিশাল এলাকা আসলে সেই অর্থে 'শুন্য' নয়; মহাবিশ্ব আসলে হতে পারে এই অদৃশ্য গুপ্ত পদার্থের এক অথই মহাসমুদ্র - আর দৃশ্যমান পদার্থগুলো তার মাঝে নগন্য কয়েকটি আলোকিত 'দ্বীপ-মালা'। এই ব্যাপারটা সত্য হলে কিন্তু ওমেগার মান ১ এর চেয়ে বড় হয়ে যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে এক সময় মহাবিশ্বের প্রসারণ বন্ধ হয়ে শুরু হবে সংকোচন।

মহাবিশ্ব সংকুচিত হতে থাকলে কি হবে? যখন সংকোচনের পালা আসবে, আশেপাশের গ্যালাক্সি গুলোর দিকে তাকালে তখন আর লোহিত সরণ দেখা যাবে না, দেখা যাবে নীলাভ সরণ (Blue Shift)। নিজেদের মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়তে থাকায় পদার্থের ঘনত্ব আর তাপমাত্রা ক্রমশঃ বাড়তে থাকবে। তারপর, যে সময়টা ধরে একসময় মহাবিশ্ব প্রসারিত হয়েছিল সেই একই সময় খরচ করে আবার অদ্বৈত বিন্দুতে ফিরে যাবে (নীচের ছবি a)। মহাবিশ্বের এই অন্তিম পতনের নাম দেওয়া হয়েছে মহাসংকোচন (Big Crunch)। অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন মহাবিস্ফোরণ আর মহাসংকোচনের মাঝে আজীবন দুলতে (Oscillate) থাকাও মহাবিশ্বের পক্ষে অসম্ভব নয়। যেমন, এ সময়কার অন্যতম খ্যাতিমান পদার্থবিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং এমন একটি সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করে বলেছেন- এই দোদুল্যমান মহাবিশ্ব (Oscillating Universe) যে অদ্বৈত বিন্দুর (Singularity point) থেকেই শুরু বা তাতে গিয়ে শেষ হতে হবে -এমনটি ভাবার কোন কারণ নেই। সংকুচিত হতে হতে অন্তিম পতনের আগ মুহূর্তে কোন এক ভাবে যথেষ্ট পরিমান চাপ সৃষ্টি হয়ে মহাকর্ষের টানকে অতিক্রম করবার মত যথেষ্ট শক্তি অর্জিত হবে যা ধাক্কা দিয়ে মহাবিশ্বকে আরেকটি প্রসারণের চক্রে ঠেলে দিবে। তার মানে মহাবিশ্বের ওইরকম কোন পরিসমাপ্তি ঘটবে না - বরং 'বাউন্স' করবে (ছবি b)।

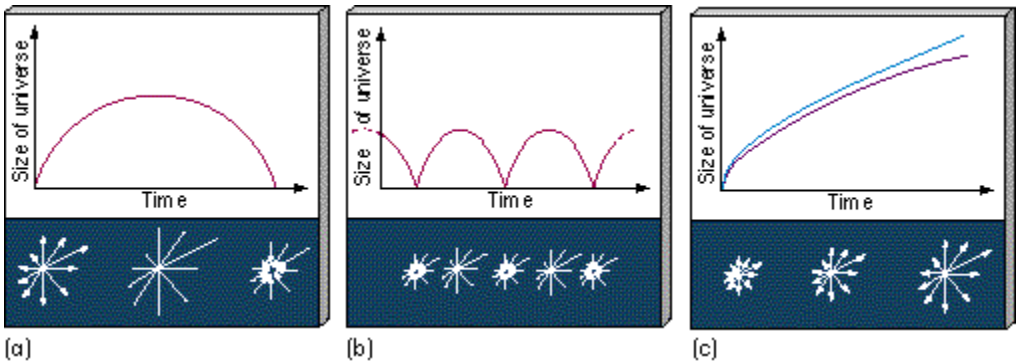

(a) *A high-density universe has a beginning, an end, and a finite lifetime. The lower frames illustrate its evolution, from explosion to maximum size to recollapse.* ***(b)*** *An oscillating universe has neither a beginning nor an end. Each expansion—contraction phase ends in a "bounce" that becomes the "Big Bang" of the next expansion. There is currently no information on whether this can actually occur.* ***(c)*** *A low-density universe expands forever from its explosive beginning. The upper*

curve represents a universe with density less than the critical value. The lower curve represents a universe with density exactly equal to the critical value.

এ ধরনের বাউন্স হয়ত চলতে থাকবে অনন্ত কাল ধরে। তবে এধারণাগুলো স্রেফ তত্ত্বকথার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। জোড়ালো কোন প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি। মহাবিস্ফোরণের পক্ষে জোড়ালো প্রমাণ পাওয়া গেছে অনেক আগেই - কিন্তু মহাসংকোচনের ব্যাপারটা কিন্তু অনেকটাই অনিশ্চিত; মহাসংকোচন একটা হাইপোথিসিস মাত্র - আর সেই হাইপোথিসিসকে বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য (ওমেগা = ১) যে পরিমান পদার্থ মহাবিশ্বে থাকা প্রয়োজন তার মাত্র একশ ভাগের এক ভাগ পদার্থের এ পর্যন্ত 'দেখা' মিলেছে।

মহাশুন্যের জ্যামিতি যদি সামতলিক হয়, আইনস্টাইনের তত্ত্ব অনুযায়ী মহাবিশ্বের প্রসারণ ধীরে ধীরে হ্রাস পাওয়া উচিৎ। মহাবিশ্বের মোট শক্তি তার মহাকর্ষের বদৌলতে ক্রমশ প্রসারণকে স্তিমিত করে আনবে এটাই স্বাভাবিক। একটা পাথরকে উপরের দিকে ছুড়ে দিলে যত উপরে উঠে ততই এর বেগ কমতে থাকে মাধ্যাকর্ষনের টানে। সেরকমই ব্যাপার অনেকটা। এ পর্যন্ত সব কিছু ঠিক-ঠাকই ছিল। কিন্তু গোল বাঁধালো ১৯৯৮ সালের একটা ঘটনা। সুপারনোভা বিস্ফোরণ নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে একদল বিজ্ঞানী যে ফলাফল পেলেন তা এক কথায় অবিশ্বাস্য। বিজ্ঞানীদের ধারণা উলটে দিয়ে দেখা গেল মহাবিশ্বের প্রসারণ আসলে হ্রাস পাচ্ছে না, বরং ত্বরান্বিত হচ্ছে। ১৯৯৮ সালের এই পর্যবেক্ষণটিকে পদার্থবিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ আবিস্কারগুলোর অন্যতম বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ব্যাপারটা সেসময় বিজ্ঞানী সমাজে এতটাই আলোড়ন তুলেছিল যে এই ব্যাপারটা 'ত্বরিত মহাবিশ্ব' (Accelerating Universe) শিরোনামে বেশ কিছুদিন ধরে পত্র-পত্রিকায় প্রথম পাতার খবর হয়েছিল।

মহাবিশ্বের এই ত্বরণের পিছনে রয়েছে মহাকর্ষ-বিরোধী এক ধরনের 'গুপ্ত শক্তি' (Dark energy) - অন্তত বিজ্ঞানীদের তাই ধারণা। এই গুপ্ত শক্তির ধরণ-ধারণ গুপ্ত পদার্থের চেয়েও বেশী রহস্যজনক। এই শক্তির বৈশিষ্ট্য এখনও বিজ্ঞানীদের কাছে অজানা - কিন্তু এটা ইতিমধ্যেই বোঝা গেছে যে, গুপ্তশক্তি আমাদের মহাবিশ্বের এক প্রধানতম উপাদান। আসলে বিশ শতকের শুরুতেই আপেক্ষিক তত্ত্বের মাধ্যমে আলবার্ট আইনস্টাইন মহাকর্ষ-বিরোধী বলের (Anti-Gravitational force) একটা ধারণা করেছিলেন। মহাকর্ষের প্রভাবে পদার্থসমূহের অবশ্যাম্ভাবী পতন এড়াতে আর সেই সাথে মহাবিশ্বকে একটা স্থিতিশীল রূপ দিতে তার সমীকরণগুলোতে আইনস্টাইন Cosmological Constant নামে একটা কাল্পনিক ধ্রুবক যোগ

করেছিলেন। কিন্তু হাবলের আবিস্কারে যখন প্রমানিত হল যে এই মহাবিশ্ব স্থিতিশীল নয় -বরং প্রসারনশীল - তখন আইনস্টাইন নিজেই ঘোষনা করেছিলেন যে, Cosmological Constant টা ছিল তার জীবনের সবচাইতে বড় ভুল (Greatest Blunder)। এই ব্যাপারটা নিয়ে চতুর্থ পর্বে কিছুটা আলোচনা করা হয়েছিল।

মনে হচ্ছে যে, আইনস্টাইনের সেই মস্ত বড় ভুলেরও ভুল ধরিয়ে দিয়ে এই একুশ শতকে অ্যান্টি-গ্র্যাভিটি আবার নতুন উদ্যমে ফিরে এসেছে। কিন্তু এই অ্যান্টি-গ্র্যাভিটি ব্যাপারটা কি? ব্যাপারটা একটু খুলে বলি। শুন্য স্থানেও (vacuum) শক্তি লুকিয়ে থাকতে পারে আর তার চাপ হবে ঋণাত্মক। ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত শোনাচ্ছে। শুন্যতায় আবার শক্তি কি রকম? আর ঋণাত্মক চাপের অর্থই বা কি? আসলে আধুনিক পদার্থবিদ্যায় শুণ্যতাকে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হয়। যেখানে কোন পদার্থ নেই সেখানেও কিছুটা শক্তি থাকতে পারে। যে শুন্যদেশকে আপাতদৃষ্টিতে শান্ত, সমাহিত ভাবা হচ্ছে, তার মধ্যেও সূক্ষস্তরে ঘটে চলেছে নানা প্রক্রিয়া। শুন্যতার মাঝে নিহিত শক্তি থেকে পদার্থকণা স্বতস্ফুর্ত ভাবে তৈরী হচ্ছে আবার তারা নিজেদেরকে ধবংস করে শক্তিতে বিলীন করে দিচ্ছে। 'স্বতঃস্ফুর্ত' শব্দটা ইচ্ছে করেই এখানে ব্যবহার করলাম। অনেকেই ঢালাও ভাবে ভেবে থাকেন যে, কারণ ছাড়া কোথাও কিছুই ঘটে না আর সৃষ্টিকর্তা ছাড়া কিছু সৃষ্টও হতে পারে না। ভ্যাকুয়াম ফ্লাকচুয়েশনের (vacuum flactuation) মাধ্যমে পদার্থ আর প্রতি-পদার্থ উৎপন্ন হওয়ার ব্যাপারটি কিন্তু একেবারেই এই ধারণার বিরোধী। এখানে স্রেফ 'শুন্য থেকে' পদার্থ তৈরী হচ্ছে কোন কারণ ছাড়াই (uncaused) এবং স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে (spontaneously)। এই ব্যাপারটি নিয়ে পরবর্তী পর্বে আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে।

আর ঋণাত্মক চাপের অর্থ কি? আসলে ঋণাত্মক চাপযুক্ত কোন বস্তু বাইরের দিকে চাপ দেবে না, ভিতরের দিকে কুঁকড়ে যেতে চাইবে। যেমন- যারা গিটার বাজায় তারা জানে যে, গিটারে তারগুলিকে জোড়ে টেনে রাখা হয় বলে এরা সবসময় ছোট হওয়ার চেষ্টা করে আর গিটারের বাহুকে বাঁকিয়ে ফেলতে চায়। এখানে গিটারের তারের চাপ কিন্তু ঋণাত্মক। যদিও উপরের উদাহরনটা খুব একটা ভাল উদাহরণ নয়, তবুও এই উদাহরণ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, ভিতরের দিকে টেনে রাখা কোন বস্তুর মহাকর্ষীয় শক্তি হবে বিকর্ষক। খুবই অবাক করা ব্যাপার। আইনস্টাইন নিজেও খুব অবাক হয়েছিলেন। তাই প্রথমে অংক মেলাবার জন্য cosmological constant কে 'গোনায় ধরলেও' পরে আবার অনর্থক ভেবে বাদ দিয়েছিলেন।

তাহলে বিজ্ঞানীদের সাম্প্রতিক পর্যবেক্ষণগুলোর সারমর্ম হল, মহাবিশ্বে এক ধরনের শক্তি আছে যার উৎস পদার্থ নয় 'এখনও অজানা' কিছু। এই শক্তি বিকর্ষক ধরনের। ফলে এই শক্তি মহাবিশ্বকে আবদ্ধ রাখতে সহায়তা করছে না, বরং প্রসারণের হার ক্রমশঃ বাড়িয়ে তুলছে। প্রসারণের হার যদি এমনিভাবে বাড়তে থাকে তাহলে শেষ পর্যন্ত মহাবিশ্বের পরিনতি কি হবে? প্রসারণ যদি বাড়তেই তাহলে গ্যালাক্সিগুলো একে অপর থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাবে- আর আলোর উৎসগুলো শক্তিক্ষয় করে একসময় অন্ধকারে ডুবে যাবে; অর্থাৎ মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ আক্ষরিক অর্থেই অন্ধকার!

সম্ভাব্য পরিনতি নিয়ে অতি সম্প্রতি উঠে এসেছে আরেকটি নতুন তত্ত্ব। ডার্ট মাউথ ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক রবার্ট ক্লাডওয়েল মনে করেন ২০০০ কোটি বছরের মধ্যে প্রসারণ এতই বেড়ে যাবে যে, এটা আক্ষরিক অর্থেই তা গ্যালাক্সিগুলোকে একসময় টেনে ছিঁড়ে ফেলবে; ছিঁড়ে ফেলবে নক্ষত্রকে, ছিঁড়ে ফেলবে গ্রহদের, ছিঁড়ে ফেলবে আমাদের সৌরজগৎকে আর শেষ পর্যন্ত ছিঁড়ে ফেলবে সমস্ত পদার্থকে। এমনকি পরমানু পর্যন্ত ছিঁড়ে যাবে অন্তিম সময়ের $১০^{-১৯}$ সেকেন্ড আগে। তবে এই মহাচ্ছেদন (Big Rip) সত্যই ঘটবে কিনা -শুধুমাত্র ভবিষ্যত গবেষণা থেকেই এটা সঠিকভাবে জানা সম্ভব।

অনেকেই ভাবেন বিগব্যাং এর তত্ত্ব প্রমাণিত হওয়ার সাথে সাথেই ঈশ্বর জাতীয় কোন কিছুর অস্তিত্ব বোধ হয় বিজ্ঞান স্বীকার করে নিয়েছে। এই ব্রহ্মান্ডের যেহেতু শরু আছে - অতএব 'পরম পিতা' জাতীয় কেউ না কেউ আছেন যিনি এই বিগব্যাং পরিচালনা করেছেন, আর এখন বসে বসে সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করছেন। সব কিছুই তাঁর মহান এক পরিকল্পনার অংশ। এই ধারণাটি শুধু সাধারণ মানুষের মধ্যেই আজ সীমাবদ্ধ নয়, ধারণাটিকে জনপ্রিয় করার কাজে প্রচার মাধ্যম এবং মুষ্টিমেয় কিছু 'বিশ্বাসী' বিজ্ঞানীও মাঠে নেমে পড়েছেন। যেমন, খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষিত পদার্থবিদ হুগ রস (Hugh Ross) তাঁর The Creator and the Cosmos বইয়ে বলেন -

> If the universe arose out of a big bang, it must have had a beginning. If it had a beginning, it must have a beginner *(সূত্র : Hugh Ross, The Creator and the Cosmos (Colorado Springs: Navpress, 1995), p. 14.)*

আবার মুসলিম সমাজে ইদানিং জনপ্রিয় হয়ে ওঠা দার্শনিক হারুন ইয়াহিয়া তাঁর একটি প্রবন্ধে বলেন -

> Scientists are now certain that the universe came into being from nothingness as the result of an unimaginably huge explosion, known as the **"Big Bang"**. In other words, the universe came into being-or rather, it was created by Allah. *(সূত্র : The Creation of the Universe, Introduction, The Scientific Collapse of Materialism http://www.harunyahya.com/create01.php)*

কিন্তু সত্যই কি তাই? বিজ্ঞান কি সত্যই এরকম কোন সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে পেয়ে গেছে? এই ব্যাপারটা নিয়ে এই সিরিজের শেষ পর্বে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে। তবে এ নিয়ে আলোচনা করতে হলে বিজ্ঞানের পাশাপাশি দর্শনের জগতেও আমাদের আমাদের পা রাখতে হবে। তার আগে স্ট্রিং তত্ত্ব সম্বন্ধেও আমাদের একটু ভাল করে জানা দরকার।

৬ষ্ঠ পর্ব...